চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ থেকে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল রাজাদের শাসনকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর আগের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ সময়কালে কোনো শাসক দীর্ঘদিন সমগ্র বাংলা জুড়ে শাসন করতে পারেন নি। তাই বিচ্ছিন্নভাবেই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে। মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের অবসানের পর এক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে কিছু স্বাধীন রাজ্যের। স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে উত্তর বাংলার রাজা শশাংক ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্য জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রায় একশত বছর এ অবস্থার মধ্যে কাটে। অতঃপর গোপাল নামে এক নেতা এ অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের পতন ঘটে। পাল শাসন যুগেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। এরপর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশ পূর্ব বাংলায় রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় দুইশত বছর সেন শাসন অব্যাহত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান শক্তির হাতে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়– বাংলার মধ্যযুগ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও তাঁদের শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাক-পালযুগের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হব;
- গুরুত্বপূর্ণ রাজ বংশগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানতে সমর্থ হব;
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারব।

প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসন-ব্যবস্থা

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা

গুপ্ত যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার তেমন কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। কেননা তখনকার মানুষ আজকের মতো ইতিহাস লেখায় অভ্যস্ত ছিল না। ভারতীয় এবং বিদেশি সাহিত্যে এ সময়কার বাংলা সম্পর্কে ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত উক্তি হতে আমরা ইতিহাসের অল্পস্বল্প উপাদান পাই। এ সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা জোড়াতালি দিয়ে সন-তারিখ ও প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭-২৬ অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় হতে প্রকৃত ইতিহাসের রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রিক লেখকদের কথায় তখন বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিত–এ উভয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলই 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান ছিল। গ্রিক গ্রন্থকারগণ গঙ্গারিডই ছাড়াও 'প্রাসিঅয়' নামে অপর এক জাতির উল্লেখ করেছে।

তাদের রাজধানীর নাম ছিল পালিবোথরা (পাটলিপুত্র)। গ্রিক লেখকদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে অনুমান করা যেতে পারে যে এ দুই জাতি একই রাজবংশের নেতৃত্বে একসঙ্গে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। এও অনুমান

করা যেতে পারে, আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি ছিলেন পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোনো রাজা। এ সময় যে বাংলার রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন প্রাচীন গ্রিক লেখকগণের লেখা থেকে তা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের মাত্র দুই বছর পর ৩২১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের উপর মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব)। অঞ্চলটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। উত্তর বঙ্গ ছাড়াও মৌর্য শাসন কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), তাম্রলিপ্ত, (হুগলী) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গ ও পরে কন্ব বংশের আবির্ভাব ঘটে। ধারণা করা হয় তারা কিছু ছোট অঞ্চলের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর বেশ কয়েকটি বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এদের মধ্যে গ্রিক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে এ আক্রমণকারীরা বাংলা পর্যন্ত এসেছিল কি-না তা বলা যায় না।

ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে। তখন বাংলায় কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট রাজ্য ও পশ্চিম বাংলার পুষ্করণ রাজ্য উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা জয় করা হলেও সমতট একটি করদ রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল হতে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি 'প্রদেশ' বা 'ভুক্তি' হিসেবে পরিগণিত হতো। মৌর্যদের মতো এদেশে গুপ্তদের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়ের পুণ্ড্রনগর।

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা

পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হুন ও ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোবর্মণের আক্রমণের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সে সুযোগে বাংলাদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বঙ্গ। এর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। দ্বিতীয় রাজ্যের নাম গৌড়। এর অবস্থান ছিল বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে।

একক কাজ ঃ বাংলার ইতিহাসে বঙ্গ ও গৌড় জনপদ দুইটির ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখ কর।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তাম্র শাসন (তামার পাতে খোদাই করা রাজার বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ) থেকে জানা যায় যে, গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন রাজা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করতেন। এঁরা সবাই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

কোন সময়ে এবং কীভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী বঙ্গ রাজ্যের পতন হয়েছিল তা বলা যায় না। ধারণা করা হয়, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা কীর্তিবর্মনের হাতে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ভিন্ন মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা বলেন, স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটলে বঙ্গ রাজ্যের পতন ঘটে। আবার স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতনের পেছনে কিছু সামন্ত রাজার উত্থানকেও দায়ি করা হয়। কারণ সপ্তম শতকের পূর্বেই দক্ষিণ বাংলার সমতট রাজ্যে ভদ্র, খড়গ, রাঢ় প্রভৃতি বংশের স্বাধীন ও সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটেছিল।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতকে 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরুষানুক্রমিক সংঘর্ষ এবং উত্তর

থেকে তিব্বতীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সামন্তরাজা শশাংক সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাংক : শশাংকের পরিচয়, তাঁর উত্থান ও জীবন-কাহিনি আজও পণ্ডিতদের নিকট পরিষ্কার নয়। কেননা তাঁর আমলের ইতিহাসের যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গেছে তাতে বহু বিপরীতমুখী বর্ণনা রয়েছে। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসককে বলা হতো 'মহাসামন্ত'। ধারণা করা হয় শশাংক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের একজন 'মহাসামন্ত' এবং তাঁর পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র।

শশাংক ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি গৌড়ে অধিকার স্থাপন করে প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। তিনি দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উড়িষ্যার উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) এবং বিহারের মগধ রাজ্য জয় করে তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের (আসাম) রাজাও শশাংকের হাতে পরাজিত হন। এরপর তিনি পশ্চিম সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুইজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। একটি পুষ্যভূতি রাজবংশের অধীনে থানেশ্বর এবং অন্যটি মৌখরি রাজবংশের অধীনে কান্যকুব্জ। পশ্চিম দিক থেকে কনৌজের মৌখরি শক্তি বাংলা অধিকারের জন্য বার বার চেষ্টা করছিল। তদুপরি সমসাময়িক সময়ে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরি রাজা গ্রহবর্মণের বিয়ে হলে কনৌজ-থানেশ্বর জোট গড়ে উঠে। এ জোটের ফলে বাংলার নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন।

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেন। এ সময়ে কনৌজের সিংহাসনে ছিলেন প্রভাকরবর্ধনের জামাতা গ্রহবর্মণ। মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত করেন। তাঁর মহিষী রাজশ্রীকে বন্দী করা হয়। দেবগুপ্ত এরপর থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু কনৌজের উপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার ও ভগ্নী রাজশ্রীকে উদ্ধার করার পূর্বেই তিনি শশাংকর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে হর্ষবর্ধন কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শশাংকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ সময় কামরূপের ভাস্করবর্মা তাঁর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। কিন্তু, এ সংঘর্ষের ফলাফল বা আদৌ কোনো সংঘর্ষ হয়েছিল কি-না সে বিষয়ে সঠিকভাবে জানা যায় না। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে শশাংক মৃত্যুবরণ করেন।

শশাংক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাং তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মবিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে শশাংক একটি বিশিষ্ট নাম। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক।

কাজ ঃ যে সকল শক্তির সঙ্গে শশাংকের সংঘর্ষ হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মাৎসান্যায় ও পাল বংশ (৭৫০ – ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূ-স্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে উঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎসান্যায়' বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎসান্যায়'।

বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিল। এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী। অষ্টম শতকের মাঝমাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘদিনের অরাজকতায় বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এ চরম দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তি লাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে তারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। দেশের জনসাধারণও এ মত সানন্দে গ্রহণ করে। এর ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি রাজপদে নির্বাচিত হলেন। পরবর্তী শাসক ধর্মপালের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ খালিমপুরের তাম্রলিপি হতে গোপালের এ নির্বাচনের কাহিনি পাওয়া যায়। গোপালের সিংহাসন আরোহণ নিয়ে তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারনাথ অবশ্য এক রূপকথার অবতারণা করেছেন। তাঁর কাহিনির সারকথা : দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ অরাজকতার ফলে জনগণের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা ছিল না। দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা একমত হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন 'রাজা' নির্বাচিত করে। কিন্তু, 'নির্বাচিত রাজা' রাতে এক কুৎসিত নাগ রাক্ষসী কর্তৃক নিহত হয়। এরপর প্রতি রাতেই একজন করে 'নির্বাচিত রাজা' নিহত হতে থাকে। এভাবে বেশ কিছু বছর কেটে গেল। অবশেষে একদিন চুণ্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়িতে এসে দেখে সে বাড়ির সবারই মন খুব খারাপ। কারণ, ঐদিন 'নির্বাচিত' রাজা হওয়ার ভার পড়েছে ঐ বাড়িরই এক ছেলের উপর। আগন্তুক ঐ ছেলের পরিবর্তে নিজে রাজা হতে রাজি হন। পরবর্তী সকালে তিনি রাজা 'নির্বাচিত' হন। সে রাত্রে নাগ রাক্ষুসী এলে তিনি চুণ্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত লাঠির আঘাতে রাক্ষুসীকে মেরে ফেলেন। পরের দিন তাকে জীবিত দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়। পরপর সাতদিন তিনি এভাবে রাজা 'নির্বাচিত' হন। অবশেষে তাঁর অদ্ভুত যোগ্যতার জন্য জনগণ তাঁকে স্থায়ীভাবে রাজা রূপে 'নির্বাচিত' করে।

গোপালের পূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাল বংশের পরিচয় ও আদি বাসস্থান সম্পর্কেও স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। গোপালের পিতার নাম বপ্যট। তিনি ছিলেন 'শত্রু ধ্বংসকারী'। পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। তাদের নামের আগে কোন রাজকীয় উপাধি দেখা যায়নি। এতে মনে করা হয়, তারা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। দয়িতবিষ্ণু 'সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ' ছিলেন। এ থেকে মনে হয়, গোপালও পিতার মতো সুনিপুণ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় পাল রাজত্বের শুরু হয়। পাল বংশের রাজাগণ একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করে। এত দীর্ঘ সময় আর কোন রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অংশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই রাজ্যভুক্ত করেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা গোপালের শাসনের বাইরে থেকে যায়। অনেকের মতে গোপাল ২৭ বৎসর শাসন করেছিলেন। কিন্তু, আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন, তিনি ৭৫৬ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন।

একক কাজ ঃ 'মাৎসন্যায়' কী? সমাজে এর প্রকাশ কীরূপ ছিল?

গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারব্যাপী তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। অষ্টম শতকের শেষ দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজার মধ্যে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। তবুও ধর্মপাল এ সময় বাংলার বাইরে বেশকিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ত্রি-শক্তির সংঘর্ষের প্রথম দিকে ধর্মপাল পরাজিত হলেও তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ, বিজয়ের পর রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। এ সুযোগে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন। কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ দখল করেন। ফলে, ধর্মপালের সাথে তাঁর যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। এ পরাজয়েও ধর্মপালের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ, পূর্বের মতো রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে আসেন এবং দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। প্রতিহার রাজের পরাজয়ের পর ধর্মপালও তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর রাষ্ট্রকূটরাজ তাঁর দেশে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন। ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন।

সোমপুর বিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ

পিতার মতো ধর্মপাল ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার বা মঠ নির্মাণ করেন। বিক্রমশীল তাঁর দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে এটি 'বিক্রমশীল বিহার' নামে খ্যাত ছিল। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এটি সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিব্বতের অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করতে আসত এবং এখানকার অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিল। নাটোর জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপালএক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। এই স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে। এর ন্যায় প্রকাণ্ড বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ওদন্তপুরেও (বিহার) তিনি সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করেন। তারনাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজা হিসেবে সকল ধর্মাবলম্বী প্রজার প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা পাল যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। তাই নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ধর্মপালের কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সঙ্গে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতি ধর্মের লোক যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন। নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য তিনি করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। তিনি যাদেরকে ভূমি দান করেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর বংশধরগণ অনেকদিন ধরে পাল রাজাদের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। অর্ধশতক পূর্বে যে দেশ অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, তাঁর নেতৃত্বে সেদেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

একক কাজ ঃ ধর্মপাল শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। এর পক্ষে ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

পাল সাম্রাজ্য

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন। দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তাঁর অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। মোট কথা, তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর তিনিই সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মুঙ্গেরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। জাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ

বালপুত্রদেবকে নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রামও প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনা হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবপাল বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারদর্শী ইন্দ্রগুপ্ত নামক ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর শাসন আমলে উত্তর-ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে উঠে।

দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন দুর্বলচেতা ও অকর্মণ্য উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন। তাঁরা পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও শক্তি অব্যাহত রাখতে পারেননি। ফলে পাল সাম্রাজ্য ক্রমেই পতনমুখী হয়। দেবপালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ৮৬১ হতে ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল দীর্ঘকাল (৮৬৬-৯২০ খিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তিনি একজন দুর্বল উদ্যমহীন শাসক ছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের সীমা ছোট হতে থাকে। নারায়ণ পালের পর একে একে পাল সিংহাসনে বসেন রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। এঁরা আনুমানিক ৯২০ হতে ৯৯৫ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় পাল রাজাদের শাসন ক্ষমতা কেবল গৌড় ও তার আশপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসব দুর্বল রাজার সময়ে উত্তর ভারতের চন্দেল্ল ও কলচুরি বংশের রাজাদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে এ সময়ে পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে কঙ্গোঁজ রাজবংশের উত্থান ঘটে।

এভাবে পাল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে, তখন আশার আলো নিয়ে এগিয়ে এলেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সুযোগ্য পুত্র প্রথম মহীপাল (আনু. ৯৯৫-১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো কঙ্গোঁজ জাতির বিতাড়ন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এরপর তিনি রাজ্য বিজয়ে মনোযোগ দেন। তাঁর সাম্রাজ্য পূর্ব বঙ্গ হতে বারানসী এবং মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়ে ভারতের দুই প্রবল রাজশক্তি তামিলরাজ রাজেন্দ্র চোল এবং চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের আক্রমণ হতে তিনি রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহীপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের উদার পৃষ্ঠপোষক। পুরাতন কীর্তি রক্ষায় তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি নালন্দায় এক বিশাল বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। বারানসীতেও তাঁর আমলে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয়।

মহীপাল জনকল্যাণকর কাজের প্রতিও মনোযোগী ছিলেন। বাংলার অনেক দীঘি ও নগরী এখনও তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি অসংখ্য শহর প্রতিষ্ঠা ও দীঘি খনন করেন। শহরগুলো হলো রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী। আর দীঘিগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি ও মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগর দীঘি বিখ্যাত। সম্ভবত জনহিতকর কাজের মাধ্যমেই মহীপাল এ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

মহীপালের পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে পাল বংশের সৌভাগ্য রবি আবার উদিত হয়েছিল। এ জন্যই ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতির যুগে প্রথম মহীপালের আবির্ভাব না ঘটলে এ সাম্রাজ্যের রাজত্বকালের সময়কাল নিঃসন্দেহে আরও সঙ্কুচিত হতো।

দলীয় কাজ ঃ প্রথম মহীপালের প্রতিষ্ঠিত শহর ও দীঘিগুলোর নাম ও অবস্থান উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মহীপাল কোন যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে পারেননি। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে শুরু করে। প্রথম মহীপালের পর তাঁর পুত্র ন্যায়পাল (আনু ১০৪৩-১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (আনু ১০৫৮-১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) পাল সিংহাসনে বসেন। এ দুর্বল রাজাদের সময় কলচুরি রাজা, কর্ণাটের চালুক্যরাজ, উড়িষ্যা ও কামরুপের রাজা বাংলা আক্রমণ করেন। সুদীর্ঘকাল একের পর এক বিদেশি আক্রমণ মোকাবেলা করতে গিয়ে পাল সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত, তখন দেশের অভ্যন্তরেও বিরোধ ও অনৈক্য দেখা দেয়। এই সুযোগে বাংলার বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বাংলার বাইরে বিহার পাল রাজাদের হাতছাড়া হতে থাকে। এভাবে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বাংলার পাল সাম্রাজ্য বহু স্বাধীন খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

এরপর পাল সিংহাসনে বসেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁর সময় পাল রাজত্বের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হয়। এ সময় উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এ বিদ্রোহ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈবর্ত নায়ক দিব্যোক বা দিব্য। তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র দখল করে নেন এবং নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বরেন্দ্র অঞ্চল যখন কৈবর্ত্যদের দখলে তখন পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বিতীয় মহীপালের ছোট ভাই দ্বিতীয় শূরপাল (আনু. ১০৮০-১০৮২ খ্রিষ্টাব্দ)। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনিই ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ সফল শাসক। প্রাচীন বাংলার কবি সন্ধাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' হতে রামপালের জীবন কথা জানা যায়। রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে রামপালকে সৈন্য, অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রকূট, মগধ, রাঢ় দেশসহ চৌদ্দটি অঞ্চলের রাজা। যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম পরাজিত ও নিহত হন। এরপর তিনি বর্তমান মালদহের কাছাকাছি 'রামাবতি' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী পাল রাজাদের শাসনামলে রামাবতিই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। পিতৃভূমি বরেন্দ্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি মগধ, উড়িষ্যা ও কামরূপের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

পাল বংশের দুর্ভাগ্য রামপালের পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ফলে, তাঁদের পক্ষে পালবংশের হাল শক্ত হাতে ধরা সম্ভব ছিল না। রামপালের পর কুমারপাল (আনু. ১১২৪-১১২৯খ্রিষ্টাব্দ), তৃতীয় গোপাল (১১২৯-১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) ও মদনপাল (আনু. ১১৪৩-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) একে একে পাল সিংহাসনে বসেন। এ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। অবশেষে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিজয় সেন পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

দলীয় কাজ ঃ পাল সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে রামপাল কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা চিহ্নিত কর।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য

পাল যুগের অধিকাংশ সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। তখন এ অঞ্চলটি ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু রাজবংশের রাজারা কখনো পাল রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে তাদের এলাকা শাসন করত, আবার কখনো পাল রাজাদের অধীনতা স্বীকার করে চলত।

খড়গ বংশ ঃ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এ সময় খড়গ বংশের রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত বাসক। কুমিল্লা জেলার বড় কামতার প্রাচীন নামই সম্ভবত এ কর্মান্ত বাসক। খড়গদের অধিকার ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলের উপর বিস্তৃত ছিল।

দেববংশ ঃ খড়গ বংশের শাসনের পর একই অঞ্চলে অষ্টম শতকের শুরুতে দেব বংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব। দেব রাজারা নিজেদের খুব শক্তিধর মনে করতেন। তাই তাঁরা তাদের নামের সাথে যুক্ত করতেন বড় বড় উপাধি। যেমন– পরম সৌগত, পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। তাঁদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতির কাছে ছিল এ দেবপর্বত। দেবদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল সমগ্র সমতট অঞ্চলে। আনুমানিক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেব রাজারা শাসন করেন।

কান্তিদেবের রাজ্য ঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার হরিকেল জনপদে নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন কান্তিদেব। দেব রাজবংশের সঙ্গে কান্তিদেবের কোনো সম্পর্ক ছিল কি-না তা জানা যায় না। তাঁর পিতা ছিলেন ধনদত্ত ও পিতামহ ভদ্রদত্ত। বর্তমান সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। বর্তমানে এ নামে কোনো অঞ্চলের অস্তিত্ব নেই। এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্র বংশ বলে পরিচিত নতুন এক শক্তির উদয় হয়। কান্তিদেবের গড়া রাজ্যের পতন হয় এ চন্দ্র বংশের হাতে।

চন্দ্রবংশ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল চন্দ্র বংশ। দশম শতকের শুরু হতে একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেড়শত বছর এ বংশের রাজারা শাসন করেন। চন্দ্রবংশের প্রথম নৃপতি পূর্ণচন্দ্র ও তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র রোহিতগিরির ভূ-স্বামী ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এ বংশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপাধি ছিল 'মহারাজাধিরাজ'। ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা), বঙ্গ ও সমতট- অর্থাৎ সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। লালমাই পাহাড় ছিল চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র। এ পাহাড় প্রাচীনকালে রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল। আনুমানিক ত্রিশ বছরকাল (৯০০-৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি রাজত্ব করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র। তাঁর শাসনামলে চন্দ্র বংশের প্রতিপত্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। নিঃসন্দেহে তিনি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও উত্তর-পূর্ব কামরূপ ও উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে তিনি তাঁর রাজধানী গড়ে তোলেন। শ্রীচন্দ্র প্রায় ৪৫ বছর (আনু. ৯৩০-৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) শৌর্যবীর্যের সঙ্গে রাজত্ব করেন।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনু. ৯৭৫-১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) ও পৌত্র লডহচন্দ্র (আনু. ১০০০-১০২০ খ্রিষ্টাব্দ) চন্দ্র বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। লডহচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন শেষ চন্দ্র রাজা। তাঁর রাজত্বকালে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ও কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করেন। এই দুই বৈদেশিক আক্রমণ চন্দ্র রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে তাদের শাসনের পতন ঘটায়।

বর্ম রাজবংশ ঃ একাদশ শতকের শেষভাগে পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গদেশে যিনি এ বংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি হলেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা এদেশে এসেছিল বলে ধারণা করা হয়। পিতার মতো প্রথম দিকে তিনিও ছিলেন কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণের সামন্তরাজ। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় তিনি শ্বশুর কলচুরিরাজ কর্ণের সাহায্য ও সমর্থনে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্মদের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবর্মা একটানা ৪৬ বছর রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

একক কাজ ঃ নিম্নের ছকের এলোমেলো তথ্যগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজাও।

সেন বংশ (১০৬১-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল বংশের পতনের পর দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তাঁরা এদেশে বহিরাগত। তাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণাত্যের কর্ণাট। কেউ কেউ মনে করেন তারা ছিলেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। যে বংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ থাকে এবং পরে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয়, তাদেরকে বলা হয় 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি যৌবনে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করে শেষ বয়সে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। তিনি কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। ধারণা করা হয় পাল রাজা রামপালের অধীনে তিনি একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনিই সম্ভবত সামন্তরাজা হতে নিজেকে স্বাধীন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় তিনি রামপালকে সাহায্য করেন। একাদশ শতকে দক্ষিণ রাঢ় শূর বংশের অধিকারে ছিল। এ বংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে তিনি বিয়ে করেন। বরেন্দ্র উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করার বিনিময়ে বিজয় সেন স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান। আবার দক্ষিণ রাঢ়ের শূর বংশের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে রাঢ় বিজয় সেনের অধিকারে আসে। এরপর বিজয় সেন বর্মরাজাকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা সেন অধিকারে নিয়ে আসেন। শেষ পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজয় সেন মদনপালকে পরাজিত করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা হতে পালদের বিতাড়িত করে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এরপর তিনি কামরূপ, কলিঙ্গ ও মিথিলা আক্রমণ করেন। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী। দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা হয় বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। বিজয় সেন পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। সেন বংশের অধীনেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল। ধর্মের দিক হতে বিজয় সেন ছিলেন শৈব। কবি উমাপতিধর বিজয় সেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞের কথা বলেছেন।

বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর রাজত্বকালে তিনি শুধু পিতৃরাজ্য রক্ষাই করেননি, মগধ ও মিথিলাও সেন রাজ্যভুক্ত করে সেন শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। চালুক্য রাজকন্যা রমাদেবীকে তিনি বিয়ে করেন। অন্যান্য উপাধির সাথে বল্লাল সেন নিজের নামের সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক

শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। গ্রন্থদ্বয় তাঁর আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

একক কাজ ঃ হিন্দুধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বল্লাল সেন কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা উল্লেখ কর।

বল্লাল সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় লক্ষণ সেনও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রাগ-জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু, তাঁর শেষ জীবন খুব সুখের ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত শাসনের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন এবং পিতার ন্যায় গঙ্গাতীরে দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। ফলে গৌড় ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও অন্তঃবিরোধের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে ডোম্মন পাল বিদ্রোহী হয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষণ সেন নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' তিনিই সমাপ্ত করেছিলেন। লক্ষণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। তাঁর রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল।

লক্ষণ সেন পিতা ও পিতামহের শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। পিতা ও পিতামহের 'পরম মহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ধর্ম চর্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খল্‌জি নদীয়া আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন কোন প্রতিরোধ না করে নদীপথে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার খলজি সহজেই অধিকার করে নেন। লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষণ সেন আরও ২/৩ বৎসর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) পূর্ব বাংলা শাসন করেন। এভাবে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে।

দলীয় কাজ ঃ প্রাচীন বাংলার শাসকগণ কেন বিভিন্ন উপাধি ধারন করতেন? উপাধিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলার শাসন-ব্যবস্থা

গুপ্ত শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এদেশে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কৌম সমাজ ছিল সর্বেসর্বা। তখন রাজা ছিল না, রাজত্ব ছিল না। তবু শাসন-পদ্ধতি সামান্য মাত্রায় ছিল। তখন মানুষ একসাথে বসবাস করত। কৌমদের মধ্যে পঞ্চায়েতী প্রথায় পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা স্থানীয় কৌম শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতেন। বাংলার এ কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই বাংলায় কৌমতন্ত্র ভেঙ্গে গিয়ে রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

গুপ্তদের সময় বাংলার শাসন-পদ্ধতির পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়। আনুমানিক দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর–বর্তমান বগুড়ার পাঁচ মাইল দূরে মহাস্থানগড়ে। অনুমান করা হয় 'মহামাত্র' নামক একজন রাজ প্রতিনিধির মাধ্যমে তখন বাংলায় মৌর্য শাসনকার্য পরিচালিত হতো। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও সমগ্র বাংলা গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না। বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না তা 'মহারাজা' উপাধিধারী মহাসামন্তগণ প্রায় স্বাধীন ও আলাদাভাবে শাসন করতেন। এ সকল সামন্ত রাজা সব সময় গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্বকে মেনে চলতেন। ধীরে ধীরে বাংলার সর্বত্র গুপ্ত সম্রাটদের শাসন চালু হয়। এ মহাসামন্তদের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন।

বাংলাদেশের যে অংশ সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ছিল তা কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি'। প্রত্যেক 'ভুক্তি' আবার কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে এবং প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সবচেয়ে ছোট শাসন বিভাগ।

গুপ্ত সম্রাট নিজে ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কোনো কোনো সময় রাজকুমার বা রাজপরিবার থেকেও ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হতো। ভুক্তিপতিকে বলা হত 'উপরিক'। পরবর্তী সময়ে শাসকগণ 'উপরিক মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। সাধারণত 'উপরিক মহারাজ'-ই তাঁর বিষয়গুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কিন্তু, কোনো কোনো সময়ে সম্রাট নিজে তাদের নিয়োগ করতেন। গুপ্তযুগের ভুক্তি ও বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিভাগ ও জেলার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গুপ্তবংশের শাসন শেষ হয়ে যায়। বঙ্গ স্বাধীন ও আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন বঙ্গে যে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা মূলত গুপ্ত আমলের প্রাদেশিক শাসনের মতোই ছিল। গুপ্তদের সময়ে রাজতন্ত্র ছিল সামন্ত নির্ভর। এ আমলে তার পরিবর্তন হয়নি। বরং সামন্ততন্ত্রই আরও প্রসার লাভ করেছে। গুপ্তরাজাদের মতো বাংলার সামন্ত রাজাগণও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। এরাও বিভিন্ন শ্রেণির বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে নতুন যুগের শুরু হয়। পাল বংশের চার শতাব্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে তাদের শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্বের মতো পাল যুগেও শাসন-ব্যবস্থার মূল কথা হলো রাজতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা স্বয়ং। পরাক্রান্ত পাল রাজারা প্রাচীন বাংলার 'মহারাজ' বা পরবর্তীকালের 'মহারাজাধিরাজ' পদবিতে সন্তুষ্ট থাকেননি। গুপ্ত সম্রাটগণের মতো তাঁরাও 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি গৌরবময় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রাজার পুত্র রাজা হতেন। এ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও ভ্রাতা ও রাজ পরিবারের অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ হতো। এ সময় হতে সর্বপ্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান রাজ কর্মচারী।

রাজ্যের সকল প্রকার শাসনকার্যের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট শাসন-বিভাগ ছিল। এর প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকতেন। রাজা মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতেন। পিতা জীবিত থাকলেও অনেক সময় যুবরাজ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল। এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল প্রধান। উৎপন্ন শস্যের উপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য হতো। যেমন-ভাগ, ভোগ, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি। কতগুলো উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য দেয় কর, ব্যবসা-বাণিজ্য শুল্ক, খেয়াঘাট হতে আদায়কৃত মাশুল ইত্যাদি ছিল সরকারের আয়ের কয়েকটি উৎস। বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ। সুতরাং এটিও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অন্যতম উৎস ছিল।

বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব ও দলিল বিভাগ দেখাশুনা করার ব্যবস্থা ছিল। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করার জন্য জমি জরিপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। মুদ্রা এবং শস্যের আকারে রাজস্ব আদায় হতো। পাল রাজাদের সময়ে শান্তি রক্ষার জন্য সুন্দর বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল। এ সময়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বাহিনী ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রণতরী– এ চারটি বিভাগে সামরিক বাহিনী বিভক্ত ছিল।

গুপ্তদের মতো পালদের সময়েও সামন্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের নানা উপাধি ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের শৌর্য ও বীর্য সামন্তদের অধীনতায় থাকতে বাধ্য করত। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করত। পাল শাসকদের শক্তি অনেকাংশে এরূপ সামন্তরাজদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করত।

পাল রাজ্যে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ ও সেন রাজত্বকালে রাষ্ট্র শাসনের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সেন বংশীয় রাজারা পাল রাজাদের রাজ-উপাধি ছাড়াও নানাবিধ উপাধি ধারণ করত। এ সময়ে রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শাসনকার্যে যুবরাজদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হত।

পূর্বের মতো সেনদের সময়েও অনেক সামন্ত শাসক ছিল। তাঁদের শক্তি ও প্রভাব খুব প্রবল ছিল। এ সকল সামন্তরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন রাজার মতোই চলত।

মোটামুটিভাবে এই ছিল প্রাচীন বাংলার শাসন–পদ্ধতি। এ শাসন ব্যবস্থায় বিদেশিদের প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তা বলা যায় না। পণ্ডিতদের মতে, শাসন পদ্ধতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সে সময়ে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় মোটেই পিছিয়ে ছিল না।

দলীয় কাজ ঃ প্রাচীন বাংলায় সরকারের আয়ের উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কোন সময়ে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ৩২১ খ্রিষ্টাব্দ

গ. ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ৩২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২. শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন-

i. পুষ্যভূতিদের দমন করতে

ii. মৌখরিদের দমন করতে

iii. রাজ্যশ্রীকে বন্দী করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

রায়গঞ্জ ইউনিয়নে সুদীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণভাবে শাসন কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু, অদক্ষ ও দুর্বল চেয়ারম্যান সুমনের শাসনামলে বিভিন্ন কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। একপর্যায়ে দুর্জয়ের নেতৃত্বে জনগণ বিদ্রোহ করে সুমনকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়।

৩. রায়গঞ্জের বিদ্রোহী নেতা দুর্জয়ের মধ্যে ইতিহাসের কোনো বিদ্রোহী নেতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. ভীম খ. দিব্য

গ. দ্বিতীয় মহীপাল ঘ. বিগ্রহ পাল

৪. চেয়ারম্যান সুমনের মতো উক্ত নেতার ক্ষমতাচ্যুতির কারণ-

i. বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা

ii. শাসক হিসেবে অদক্ষতা

iii. জনগণের সমস্যা সমাধানে অপারগতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১ অজয় তার পরিবারের পুরাতন নিবাস ত্যাগ করে নবীনগরে নতুনভাবে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে তিনি নবীনগরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি বহুবিধ কার্যসম্পাদন করেন। এছাড়া তার পরবর্তী বংশধরেরাও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোকজন বৈষম্যের শিকার হতেন।

ক. খড়গ বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?

খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয় কেন?

গ. নবীনগরের শাসক অজয়ের কর্মকাণ্ডে কোন সেন শাসকের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকের বংশধরেরা শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২. রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন বড়ুয়া তার এলাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তার এলাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুবিধার বিষয়ে তিনি মনোযোগী হন। তিনি তার পৌর সভায় শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনেও সমর্থ হন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার সুযোগ লাভ করেন।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বুঝায়?

গ. আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে ধর্মপালের কোন কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৌমেন বড়ুয়ার দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার পিছনে কাজ করেছে ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা'- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।